মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী নারী

তরুণকান্তি মন্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরসুনা কলেজ, ই-মেইল- tarunmandal12@gmail.com

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের আদিম যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে নারীদের কথা চর্চিত হয়নি। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জনজীবনের গভীর অন্দরমহলে প্রবেশ করে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আদিবাসীদের নারীদের বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়নের চিত্র তাঁর ছোটগল্পগুলিতে তুলে ধরেছেন। ব্রাত্যজীবনের সংগ্রামী লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল কাটিয়ে আদিবাসী নারীদের সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন।

সূচক শব্দ: নারী, আদিবাসী, শোষণ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, কুসংস্কার

মূল আলোচনা: মহাশ্বেতা দেবী শুধু কথাসাহিত্যিক হতে চাননি, তিনি বঞ্চিত মানুষদের একজন হয়েই প্রান্তিক মানুষদের বঞ্চনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণির জীবনযাপন ও শ্রেণিচেতনা ফুটে উঠেছে। গ্রামীণ আদিবাসী সম্প্রদায় ও মহিলা তাঁর রচনার প্রধান বিষয়বস্তু। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে যেমন অন্তেবাসী, আদিবাসী, ব্রাত্য মানুষদের সুখ দুঃখের বাস্তব ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তেমনিভাব তাঁর ছোটগল্পগুলিতে তিনি সমাজের মূলধারা থেকে যারা একেবারে বিচ্ছিন্ন তাদের কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি সেই অসহায়, নিঃস্ব, রিক্ত মানুষদের জন্য লেখনি ধারণ করেন। তিনি শুধু তাদের সমস্যার কথা পাঠকবর্গকে জানাননি, তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে তাদের সুখ দুঃখের অংশদীর হয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর বহুগল্পের কেন্দ্রবিন্দু হল আদিবাসী জনজীবন। স্বার্থলোলপু এক শ্রেণির মানুষ সহজ সরল আদিবাসীদের দুর্বলতার সুযোগে নানা কুসংস্কার ও ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়ে অন্যায় ভাবে দিনের পর দিন বঞ্চিত করে রেখেছে। সেই ভণ্ড প্রতারকদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করাই ছিল মহাশ্বেতা দেবীর লক্ষ্য। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর নিজস্বতায় ও ব্যাপক সামাজিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। লেখিকা সর্বদাই তথ্যসংগ্রহ, ক্ষেত্রসমীক্ষা তথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর গল্পের কাহিনী, চরিত্র নির্মাণ করতেন। বিষয় যখন আদিবাসী সমাজ তখন জঙ্গল, মাটি, পাহাড়ের গন্ধ গায়ে মেখে দলিত সেই মানুষগুলির অসহায়তা প্রত্যক্ষ করে তিনি ধীরে ধীরে তাদেরই একজন হয়ে উঠলেন। নিম্নবর্গীয় আরণ্যক মানুষ এবং তাদের জীবন, মহাশ্বেতা দেবীর আগে ও পরে অনেক লেখকেরই সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু লেখিকার কাছে আদিবাসী সমাজ কেবল সাহিত্যের বিষয়মাত্র নয়— নিছক সাহিত্য রচনার রোমান্টিক আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এদের

জীবন যেন তাঁরই জীবনের অংশ। পশ্চিমবঙ্গের লোধা, শবরদের আদিবাসী গ্রামে প্রথম কাজ শুরু করলেও পরে তা প্রসারিত হয় বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে। তিনি সচেতন ভাবেই মধ্যবিত্তের পরিসরকে ত্যাগ করে ব্রাত্য-দলিত মানুষের জীবনবৃত্তান্ত রচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

'দ্রৌপদী' গল্পটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত মহাশ্বেতা দেবীর অনবদ্য সৃষ্টি। এই গল্পে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়ে দ্রৌপদীকে লেখিকা প্রতিবাদী চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন রাজসভায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে এক অসাধারণ প্রতিবাদী চরিত্ররূপে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। দ্রৌপদী চরিত্রটি বহুদিনের জমে থাকা অত্যাচার, উৎপীড়নের এক জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ। দ্রৌপদী তার উপর ধর্ষণের প্রতিবাদ সে নিজেই করে। সে নিজেকে নগ্ন করে ফেললে সমস্ত রকমের বীরত্ব এবং বিক্রমের বর্ম খুলে পরে। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী রমনীর মধ্যে খুব সযত্নে দেশপ্রেমের জাদুমন্ত্র দিয়ে দ্রৌপদী নির্মাণ করেছেন। 'দ্রৌপদী' গল্পে পূর্বসূত্র রয়েছে 'অপারেশন বসাই টুডু' গল্পের মধ্যে। বসাই টুডুর বিশ্বস্ত সৈনিক ছিলেন দ্রৌপদী এবং তার স্বামী দুলন মাঝি। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে অপারেশন বাকুলিতে জোতদার সূর্য সাউকে হত্যার অন্যতম দুই কারিগর ছিল এই সাঁওতাল দম্পতি। সেই দ্রৌপদীকে আরও বিস্তৃত করে প্রকাশ করেছেন বর্তমান গল্পে। দ্রৌপদী একাধিক চরমপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে নানা আক্রমণ করে। সেখান থেকে বন্দুক লুঠ করে, এমনকি হত্যাকাণ্ডেও অংশ নেয়। নির্ধারিত কর্মে সাফল্য লাভের পর সে গান ধরে—

> "হেনদে রামব্রা কেচে কেচে
> পুনড়ি রামব্রা কেচে কেচে।"[১]

পুলিশের খাতায় তার নাম বিশেষ রূপে শোভা পায়—

> "নাম দোপদি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি (নিহত), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারবে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা।"[২]

পুলিশের হাতে ধরা পরার পর শুরু হয় এক নারকীয় পর্ব গণধর্ষণ। ক্ষত বিক্ষত হয় দ্রৌপদীর শরীর। সমস্ত রাত্রি ধর্ষণের পর দ্রৌপদীকে শাড়ি জড়িয়ে সেনানায়কের সামনে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাদের বিশ্বাস এরূপ পাশবিক অত্যাচারের পর দ্রৌপদী নিশ্চয় সহকর্মীদের নাম বলে দেবে। কিন্তু ক্রোধে, ক্ষোভে উন্মত্ত দ্রৌপদির অন্যরূপ আমরা দেখি। সেনাদের দেওয়া শাড়ি ছুঁড়ে ফেলে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে সেনানায়কের সামনে দাঁড়ায় দ্রৌপদী।

> "কাপড় কী হবে কাপড় লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে মরদ তু ... হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরতে দিব না। ... লে, কাঁউটার ক... দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে

সেনানায়কে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[৩]

মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' গল্পগ্রন্থটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র তিন নারী। যারা ব্রাত্য সমাজের বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে। গল্পগুলি মূলত অরণ্যাশ্রয়ী আদিবাসী মানুষদের জীবন বিপর্যয়ের কথা নিয়ে রচিত। এখানে লেখিকা দেখিয়েছেন আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির নারীর দুঃখ দুর্দশার চিত্র। 'রুদালী' গল্পগ্রন্থের প্রথম কাহিনী 'রুদালী'। 'রুদালী' গল্পের প্রধান চরিত্র শনিচরী গঞ্জু জাতের বউ। গঞ্জু জাতির মেয়েরা এমনিতেই অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। তার উপর শনিবার দিন জন্ম বলে শাশুড়ি পর্যন্ত তাকে অপয়া বলত। সংসারটাকে ঠিকমত চালানোর জন্য সে মহাজন মালিকের বাড়িতে কাজ করেছে, স্বামীর সঙ্গে ক্ষেত খামারের কাজেও সে যোগ দিয়েছে। সংসার বাঁধার কত আশা সে পোষণ করেছে। কিন্তু এক এক করে তার সমস্ত আশার মুকুল না ফুটেই শুকিয়ে গেছে। সব হারিয়ে শেষপর্যন্ত নিজেদের মানুষের জন্য কাঁদতেও পারেনি। এই দরিদ্র অসহায় নারীর কথা কেউ ভাবেনি। লেখিকা এখানে গঞ্জ সমাজের অন্ধকার ব্যবস্থা থেকে খুঁজে নিয়ে এসেছেন বিচিত্র মহিলাদের।

'রুদালী' গ্রন্থের আর একটি গল্প 'টুংকুড়'। 'টুংকুড়' শব্দের অর্থ কাটা ধানের শিষ। গল্পে লেখিকা অন্ত্যজ শ্রেণির নারী জীবনের দুঃসহ দুরবস্থার কথা তুলে ধরতে গিয়ে আলতা দাসির দুঃখ-দীর্ণ জীবনকাহিনি তুলে ধরেছেন। তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজ কীভাবে অসহায় নারীদের জীবন নিয়ে টানাটানি করত, তা আলতা দাসীর মাধ্যমে লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন। দুলে ঘরের মেয়ে আলতা দাসী। গ্রামের ধনী জমিদার মণ্ডলের লালসার কারণে তাদের জমিজমা নষ্ট হয়েছে। তাই কেবলমাত্র 'টুংকুড়' অর্থাৎ কাটা ধানের শিষ কুড়ানোর অধিকারটুকু পেয়েছে। এক দুর্যোগের সময়ে মণ্ডলের বড় ছেলে গোপাল আলতা দাসীর যৌবন নিয়ে খেলা করে তাকে গর্ভবতী করেছে। আলতা দাসী তার সমাজ থেকে যেমন লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছে, তেমনি শেষপর্যন্ত সে মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর মণ্ডলদের কুকর্ম, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

'গোহুমনি' গল্পে লেখিকা স্বাধীনাত প্রাপ্তির পরও পালামৌয়ের সুবিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে কিভাবে শ্রমিকদের উপর নানাভাবে শাসন, শোষণ, অত্যাচার করত তারই বাণীচিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অরণ্যজীবী আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে সমাজের নারীর বেদনার কথাও প্রচার করেছেন। এই গল্পে ঝালো ওরফে গোনুমনি নিজের অস্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লড়াই করতে ভয় পায়নি। ঠিকাদারের প্ররোচনায় পড়ে ঝালোর স্বামী বিশাল ভুঁইঞা বেশ কিছুদিনের মতো নিরুদ্দেশ থাকে। ঝালোকে জোর করে সমাজ বিধবা করেছে। সমস্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঝালো বিশ্বাস হারায়নি, বরং সংগ্রাম করে গেছে এবং একদিন তার স্বামীকে সে ফিরে পেয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাস, মনের জোর এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং লড়াই করে ঝালো সংসারের সুখ এনেছে।

'স্তনদায়িনী এবং অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পগুলিতেও নারীজীবনের মর্মবেদনা কাহিনি বিবৃত হয়েছে। 'জগন্নাথের রথ' শীর্ষক গল্পে আছে পূণ্যদাসীর বেদনাবিধুর জীবনের ইতিহাস, আছে তার বিশ্বাসের কথা।

সমাজে এরা কতখানি উপেক্ষিতা, অবহেলিতা লেখিকা তাদের জীবনের সেই মর্মবিদারক দৃশ্যটিও তুলে ধরেছেন। 'বায়েন' গল্পে ভগীরথের সতমা যশির দুঃখদীর্ণ নারী জীবনের অসামান্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। বায়েন ওদের সমাজে ডাইনের মতো অপরাধী, তাদের দৃষ্টি খারাপ। সমাজ অকারণে তাদের শাস্তি দেয়, পাথর ছুঁড়ে মারে।

'শিকার' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী অন্তেবাসী মানুষদের প্রতিরোধস্পৃহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন সুরে রূপায়িত করেছেন। এই গল্পটি আদিবাসী ওঁরাওদের নিয়ে লেখা। এই গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্রি মেরী ওঁরাও। মেরী ওঁরাও সাহেবের জারজ হিসাবে পরিচিত বলে তার সমাজ তাকে অনেক দূরত্বে ঠাঁই দিয়েছিল। মেরী অন্য আদিবাসীদের মেয়েদের মতো গতানুগতিক জীবন কাটাতে চায়নি। তাই প্রসাদ গিন্নী তার বিয়ের কথা বললে মেরী মুখের উপর বলে দেয়—

> "ঝোপড়িতে থাকব, মরদ মদ খাবে, তেল সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, এমন জীবন আমি চাই না।"[৪]

ওঁরাও সমাজের চিরাচরিত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে সে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। তহশীলদার ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় শিকার। তাই গল্পের শেষে দেখি, তার ভালবাসার বন্ধু জালিমকে নিয়ে সে যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল তহশীলদারকে হত্যা করে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল। দিনটি ছিল তাদের শিকার পরবের দিন, মেরীর জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন।

'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়ের পাখমারা সম্প্রদায়ের সাধন কান্দোরীর মা জঠি ঠাকুরানীর আশ্চর্য জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। জটেশ্বরীকে সূর্য ওঠার আগে এবং অস্ত যাওয়ার পর মা বলে ডাকার নিয়ম ছিল। তাই তাকে 'সাঁঝ সকালের মা' বলা হত। দিনের বেলায় সে জটি ঠাকুরানী। লেখিকা জটেশ্বরীকে একাধারে সাধনের মা এবং অন্যদিকে ঠাকুরানী নারী— এই দুইরূপে প্রকাশ করেছেন।

লেখিকার 'স্তনদায়িনী', 'ডাইনি', 'যশোমতি', 'বিশলাক্ষীর ঘর', 'হারুন সালেমের মাসি', 'যমুনাবতীর মা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে আমরা নারীজীবনের করুনাঘন বেদনার্ত জীবনকাহিনির সঙ্গে পরিচিত হই। লেখিকা গঞ্জু, দুসাদ, ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের দুঃখদীর্ণ শোষিত, অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িত জীবনকাহিনীর বাস্তব ইতিহাসকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সমাজের অসহায়, লাঞ্ছিতা নারীদের ব্যথাতুর জীবনের কথা বলতে ভুলে যাননি।

'ডাইনি' গল্পে দেখি হনুমান মিশ্রের ছেলে টুরা গ্রামের পহানের বোবা মেয়েকে নষ্ট করে। হনুমান মিশ্র সেই মেয়ে অর্থাৎ সোমরিকে নিজের ইচ্ছেমত বিধান দিয়ে ডাইনী করে দেয়। গ্রামে কোন বিপদ দেখা দিলে তারজন্য সোমরিকে দায়ী করা হয়। লেখিকা দেখিয়েছেন আদিবাসী গ্রামগুলি কিভাবে কুসংস্কারে আবদ্ধ।

'রাবনবধ' শবর আদিবাসীদের নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি বিখ্যাত গল্প। ত্রিলোকের মত বাবুরা শবরদের কিভাবে দিনের পর দিন ঠকিয়ে যাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ছোটগল্পগুলির মাধ্যমে সমস্ত ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন তাই নয়; নিরীহ আদিবাসীদের উত্তরণের পথ দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। তাই তাঁর লেখা শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করে না, তা হয়ে যায় একটি বিশেষ সময় ও সমাজের দলিল।

অরণ্যের স্নেহকাতর সুন্দর পরিবেশে যুগযুগান্তর ধরে যে জাতির মানুষ বসবাস করে আসছে তারাই আদিবাসী নামে সুপরিচিত। মহাশ্বেতা দেবী অরণ্য সংলগ্ন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনকথা প্রকাশ করেছেন তাঁর রচিত বিভিন্ন ছোটগল্পে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংসার ও সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী যে নারী তাদের জীবনের বিপন্নতা, অসহায়তার সকরুণ চিত্র উঠে এসেছে ছোটগল্পগুলিতে। আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজের নারীরা আজও সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের শিকার। তবে আদিবাসীদের মধ্যেও যে ক্রমশ চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটছে এবং তারা অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে মহাশ্বেতা দেবীর বেশ কয়েকটি গল্পে তার পরিচয় পাই। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'দ্রৌপদী' গল্পে দ্রৌপদীর কথা। এই আশ্চর্য জীবন্ত নারী চরিত্রটি তার প্রতি পাশবিক অত্যাচার ও নিপীড়নের যোগ্য জবাব দিয়েছে। 'শিকার' গল্পে মেরী ওঁরাও আর একটি অসাধারণ প্রতিবাদী নারী চরিত্র। ওঁরাও সমাজকে তার চিরাচরিত সংস্কার ও বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী জীবনভিত্তিক গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, লেখিকা আদিবাসী মহিলাদের জীবনের অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ বেদনার একান্ত বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আদিবাসী নারীদের শুধু বঞ্চনা, শোষণ নয়, সেই বঞ্চনা থেকে পরিত্রাণের উপায় বাতলে দিয়েছেন দরদী লেখিকা।

তথ্যসূত্র:

১. মহাশ্বেতা দেবী: রচনা সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪১১
২. তদেব, পৃ. ৪১০
৩. তদেব, পৃ. ৪১৮
৪. মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৬